নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: সমন্বিত উদ্যোগের এখনই সময়

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

বাংলাদেশে সড়ক ও নৌ পথে দুর্ঘটনা একটি দীর্ঘদিনের জাতীয় সমস্যা। প্রতিনিয়ত প্রাণহানি, পঙ্গুত্ব ও অর্থনৈতিক ক্ষতির মাধ্যমে দুর্ঘটনা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনা এখন জননিরাপত্তার অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। তাই দুর্ঘটনা হ্রাসে সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি। দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও মানুষের দৈনন্দিন চলাচলের প্রধান মাধ্যম হলো সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এছাড়াও দেশের যোগাযোগ, অর্থনীতি ও জনজীবনের একটি বড়ো অংশ নৌপথনির্ভর। প্রতিদিন লাখো মানুষ নৌযানে চলাচল করে এবং বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবহণ হয় নদীপথে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নৌ দুর্ঘটনা আমাদের দেশের উদ্বেগজনক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো নৌপথ ও সড়কপথ দুটিতেই প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও প্রাণহানির খবর শোনা যায়। পরিবার হারায় স্বজন, রাষ্ট্র হারায় কর্মক্ষম জনশক্তি, আর সমাজে সৃষ্টি হয় দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি। তাই নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এখন শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়।

দেশের শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সড়কগুলো দিন দিন অনিরাপদ হয়ে উঠছে। যানবাহনের চাপ বৃদ্ধি, বেপরোয়া গতি, অদক্ষ চালক, ট্রাফিক আইন অমান্য, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, যত্রতত্র ব্যাটারি চালিত রিকশা বা অটোরিকশার অবাধ চলাচল এক প্রকট সমস্যা ও জনজীবনের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অবৈধভাবে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে হকার বসানোর কারণে সড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। জীবিকার তাগিদে হকারদের এই কার্যক্রম যেমন বাস্তবতা, তেমনি এটি এখন সড়ক নিরাপত্তার জন্য বড়ো হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

নৌ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। নৌ দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য বহন, নৌযানের ফিটনেস সনদহীন চলাচল, অদক্ষ চালক, নাব্যতা সংকট, নৌপথে পর্যাপ্ত সংকেতব্যবস্থার অভাব, যত্রতত্র টলার ও বাল্কহেড চলাচল এবং প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে যাত্রা করা। অনেক লঞ্চ বা ট্রলার প্রয়োজনীয় লাইফ জ্যাকেট বা উদ্ধার সরঞ্জাম ছাড়াই চলাচল করে, যা দুর্ঘটনার সময় প্রাণহানির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। সকল নৌযানের ফিটনেস পরীক্ষা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে এবং লাইসেন্সবিহীন চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নদীপথে আধুনিক নেভিগেশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বয়া ও সিগন্যাল স্থাপন করতে হবে। আবহাওয়া সতর্কতা অমান্য করে যাত্রা শুরু করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মালিকদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। সর্বোপরি অনুমোদনহীন জলযান চলাচল বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার, অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে চলা এবং নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। নৌ দুর্ঘটনা কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; এটি সামাজিক সচেতনতার সঙ্গেও সম্পর্কিত। বাংলাদেশের নৌপথ নিরাপদ করা এখন সময়ের দাবি। কার্যকর আইন প্রয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জনসচেতনতার সমন্বয় ঘটাতে পারলে নৌ দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। প্রতিটি দুর্ঘটনার পর শোক প্রকাশ নয় প্রয়োজন প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ। নিরাপদ নৌযাত্রা নিশ্চিত করাই হোক আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার।

সড়ক পথের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো কঠোর আইন প্রয়োগ। সড়কে গতি নিয়ন্ত্রণ, ওভারটেকিং নিয়ম মেনে চলা, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। আইন বাস্তবায়নে দৃশ্যমান কঠোরতা থাকতে হবে। একইভাবে সড়কপথে ফিটনেস সনদ ছাড়া কোনো যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

চালক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। দক্ষ চালক তৈরি না হলে দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব নয়। ড্রাইভিং স্কুলগুলোকে মানসম্মত করতে হবে এবং লাইসেন্স পরীক্ষাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করা সময়ের দাবি। চালকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডোপ টেস্ট ও মানসিক সক্ষমতা যাচাই করাও প্রয়োজন। দীর্ঘসময় টানা গাড়ি চালানো ক্লান্তি তৈরি করে, যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

মহাসড়কে আলাদা লেন, পর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইট, স্পিড ব্রেকার ও জেব্রা ক্রসিং স্থাপন করতে হবে। গ্রামীণ সড়কেও নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করা জরুরি। একইভাবে নদীপথে নৌরুট চিহ্নিতকরণ, আধুনিক নেভিগেশন ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল মনিটরিং চালু করা প্রয়োজন।নৌ ও সড়ক পথে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা, স্পিড মনিটরিং ডিভাইস, অটোমেটিক ট্রাফিক সিস্টেম এবং জিপিএস ট্র্যাকিং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। নৌযানে রাডার ও আবহাওয়া সতর্কতা প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করলে ঝড় বা বৈরী পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমবে। দূর্ঘটনা হ্রাস করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। অনেক সময় পথচারী ও যাত্রীর অসচেতন আচরণও দুর্ঘটনার কারণ হয়। নির্ধারিত স্থানে রাস্তা পার না হওয়া, চলন্ত গাড়িতে

ওঠানামা করা কিংবা অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে নৌযানে ওঠা বিপজ্জনক। স্কুল, কলেজ, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে নিয়মিত সচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে। নিরাপদ চলাচলকে সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থার উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনার পর দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা পেলে অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। মহাসড়ক ও নদীপথে পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স, উদ্ধার জাহাজ ও প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী রাখতে হবে। 'গোল্ডেন আওয়ার' ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা গেলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি পরিবহন মালিক, শ্রমিক সংগঠন এবং সাধারণ জনগণের সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে। মালিকদের উচিত মুনাফার চেয়ে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। অতিরিক্ত ট্রিপের চাপ চালকদের উপর না দিলে দুর্ঘটনা কমবে। একই সঙ্গে যাত্রীদেরও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন বর্জন করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতির তথ্য মতে গত বছর ৭ হাজার ৩৬৯টি সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনায় ৯ হাজার ৭৫৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৫ হাজার ৯৬ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৯৩টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২ হাজার ৯৮৩ জন নিহত এবং ২ হাজার ২১৯ জন আহত হয়েছেন। এ সংখ্যা যথাক্রমে মোট দুর্ঘটনার ৩৭.৪ শতাংশ, নিহতের সংখ্যার ৩৮.৪৬ শতাংশ এবং আহতের সংখ্যার ১৪.৯৮ শতাংশ। রেলপথে ৫১৩টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ৪৮৫ জন নিহত এবং ১৪৫ জন আহত হয়েছেন। নৌপথে ১২৭টি দুর্ঘটনায় ১৫৮ জন নিহত, ১৩৯ জন আহত এবং ৩৮ জন নিখোঁজ হয়েছেন। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে সড়কে দুর্ঘটনা বেড়েছে ৬.৯৪ শতাংশ। আর মৃত্যুর হার বেড়েছে ৫.৭৯ শতাংশ। আহতের হার ১৪.৮৭ শতাংশ বেড়েছে। আর এই এক বছরে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত যানবাহনের সংখ্যা ১০ হাজার ২৮৮ টি।

এক গবেষণায় থেকে পাওয়া তথ্য মতে নৌ দুর্ঘটনায় বছরে প্রায় ২০০-৫০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশের জিডিপি'র দেড় থেকে আড়াই শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। কর্মক্ষম বিবেচনায় টাকার অংকে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। বিআরটিএ এবং রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসেবে এমন তথ্য মিললেও সম্পদসহ অন্য ক্ষয়ক্ষতি ধরলে আর্থিক ক্ষতি ৮৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। দুর্ঘটনার কারণে সড়কে যত লোকের প্রাণহানি হয় তার ৯২ শতাংশই স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সড়ক নিরাপত্তায় মনোযোগ দেওয়ার তাগিদ বিশ্লেষকদের।

নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বহুমাত্রিক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সড়ক ও নৌপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেগুলো হলো আইন ও শাস্তি কঠোর করা, চালকদের প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, নৌযানের নিবন্ধন ও ফিটনেস নিশ্চিতকরণ, নৌপথ নিরাপত্তা জোরদার করা, দক্ষ নাবিক ও সারেং নিয়োগ, উদ্ধার ও জরুরি সেবা উন্নয়ন, আইন প্রয়োগ ও তদারকি বৃদ্ধি, আবহাওয়ার তথ্য ও আইন প্রনয়ণ। নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে হলে মানবিকতা ও শৃঙ্খলার সমন্বয় প্রয়োজন। হকারদের পুনর্বাসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় কঠোরতা এই দুইয়ের সমন্বিত প্রয়োগই পারে দুর্ঘটনামুক্ত দেশ গঠনের পথ দেখাতে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দুর্ঘটনা আরও বাড়বে এবং এর মূল্য দিতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

সবশেষে বলা যায়, নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা কোনো অনিবার্য নিয়তি নয়; এটি প্রতিরোধযোগ্য মানবসৃষ্ট সমস্যা। পরিকল্পনা, কঠোর আইন প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতা এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের সমন্বয়। মানুষের জীবনই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ নৌপথ নিশ্চিত করা ছাড়া বিকল্প নেই। দুর্ঘটনা কমানোই হবে মানবিক বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার